বাংলায়

শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার

গৌতম দাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সমকালীন বঙ্গীয় শিল্পকলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কিত বাংলায় রচনা খুব বেশি আছে বলে আমার ধারণা নেই। সম্প্রতি লিখিত 'বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার' বইটি একটি গুরুতর অভাব পূরণ করেছে বলে আমি মনে করি। এই বইয়ের যে-প্রসঙ্গ তাঁর শুরুয়াত সঠিক কারণে কোম্পানী চিত্রশৈলীর থেকেই বলা হয়েছে, কারণ তার আগে বাংলায় কোনো বিশেষ চিত্রকলার ঘরানা তৈরি হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। পাল-সেন যুগে যে তালপাতার পুঁথিতে চিত্র-অলঙ্করণ হয়েছিল তাকে বিশেষ করে কোনো বঙ্গীয় শৈলী বলে ধরে নেওয়া যায় না। সেই বৌদ্ধিক শৈলী মোটামুটি তখন সমস্ত উত্তর ভারতেই চালু ছিল।

কোম্পানী-যুগে যে মুসলমান চিত্রকরেরা মুর্শিদাবাদ নবাবের পতনের পর কলকাতায়, পাটনায় এবং কয়েকটি অন্য শহরাঞ্চলে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে, তাঁরা যে শৈলী তৈরি করলেন, এবং যা পরবর্তীকালে কোম্পানী শৈলী বলে পরিচিত হল, তাঁদের শৈলীতে ব্রিটিশ বাস্তববাদী অ্যাকাডেমিসিজম এবং মোঘল শৈলীর মিশ্রণ ঘটেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সংমিশ্রণকে আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসে একটি চমৎকার এবং নিতান্তই আকর্ষণীয় পর্ব বলে মনে করি। এই সংমিশ্রণ ঘটেছিল একদিকে ব্রিটিশ অফিসারদের বাস্তববাদী চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ এবং যা আমাদের স্থানীয় শিল্পীরা এই বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের খুশি করতে আত্মীকরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা, তার সঙ্গে মোঘল মিনিয়েচার শৈলীর পদ্ধতি মিশিয়ে হয়েছিল এই বিশিষ্ট শৈলীর জন্ম। তার বেশ কিছুকাল পরে প্রবল স্বদেশীয়ানার তাগিদে যে নিউ-বেঙ্গল স্কুলের আবির্ভাব হল, তার বিস্তৃত বিবরণ এ বইটিতে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এখানকার আর্টস্কুলে যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হত এবং তার ফলে যে ধরনের অয়েল পেন্টিং-এর প্রবর্তন এবং অন্য বিদেশী প্রভাব তখনকার চিত্রকরদের কাজের মধ্যে দেখা যেত তারও উল্লেখ আছে। সরকারি আর্ট স্কুলের সঠিক ভূমিকা কী ছিল, তাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার বিস্তৃত ইতিহাস চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক থেকে নিয়ে ষাট-সত্তর-আশি দশক অবধি যে মহত্বপূর্ণ এই শিল্পকলার পরিবর্তন ঘটেছে তাও এই বইতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। আমার ধারনায় পাঠকেরা বিশেষ করে শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বই থেকে অনেক তথ্য পাবেন। যা তাঁদের পক্ষে জানা জরুরি। তাছাড়াও সাধারণ শিল্পানুরাগীরাও আমাদের বঙ্গীয় শিল্পকলার কাহিনী অবগত হয়ে বিশেষভাবে লাভবান হবেন। আমি মনে করি এ ধরনের একটি বই-এর অভাব বহুদিন ধরেই ছিল, সে অভাব লেখক পূর্ণ করে আমাদের সকলকেই কৃতজ্ঞবদ্ধ করেছেন।

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর ১৯৯৯

পরিতোষ সেন

সূচনা

দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলার শিল্প-চর্চার ধারাবহিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই লেখারই উত্তরণ। তবুও সংশয় আছে যে, সম্পূর্ণ ইতিহাসটি তুলে ধরতে পেরেছি কিনা। ১৮০০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই দুশো বছরকে নিয়ে এই গ্রন্থ। এই দুশো বছরে বাংলায় শিল্পচর্চার উন্নতির লক্ষ্যে যে সকল চারুকলা সমিতি এবং শিল্পচর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এতে রাখা হয়েছে। কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পচর্চাকেন্দ্র, সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসটিও দশটি পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘ আট বছর শিল্পশিক্ষা নিয়েছি। হ্যাভেল, অবনীন্দ্র-অনুগামীদের কাছে তাই ব্যক্তিগত ঋণ অপরিশোধ্য। সে কৃতজ্ঞতার জন্য গ্রন্থটি লিখিনি। পাঠকদের মনে হতে পারে সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসকে গুরুত্ব দেবার কারণ কী? প্রথম উত্তর হল, উনিশ শতকে যখন বাংলার শিল্পচর্চা পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল, সে-সময়ে ওই শতকের মাঝমাঝি সময়ে বেথুন সোসাইটি এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এই প্রাচীন শিল্পবিদ্যালয়টিই (বর্তমানে মহাবিদ্যালয়) বাংলার শিল্পজগৎকে নতুন করে সৃষ্টির পথ দেখিয়েছিল। দ্বিতীয়ত এই বিদ্যালয়টির অসংখ্য কৃতি শিল্পী ছাত্র-ছাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে এবং এর প্রসার ঘটিয়েছে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশেও।

সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয় ছাড়াও ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ, কলা ভবন এবং রবীন্দ্র ভারতীর দৃশ্যকলা অনুষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে গ্রন্থটিতে। দুশো বছরের ইতিহাসটিকে আটটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে স্মরণীয় কালক্রম, টীকা ও তথ্যসূত্র, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।

গ্রন্থটির বেশ কিছু প্রবন্ধ পূর্বেই প্রকাশ করেছিল বেশ কিছু পত্রিকা। অবশেষে পাণ্ডুলিপিটির প্রতি 'পুনশ্চ'-র প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক আগ্রহ প্রকাশ করলে সেটি গ্রন্থাকারে পাঠক সমাজে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত হয়।

গ্রন্থটি পাঠ করে তরুণ শিল্পী ছাত্র-ছাত্রীদের যদি শিল্প ইতিহাসকে আরো গভীর ভাবে জানার উদ্রেক হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়।

কলিকাতা বইমেলা,
২০০০

গৌতম দাস

সূচিপত্র

কোম্পানী যুগে শিল্পচর্চা ৩৩
শিল্পবিদ্যালয়ের সূচনা ৫১
সরকারি শিল্পবিদ্যালয় ৬৭
সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয় ১০৫
নব্য-বঙ্গীয় শিল্পচর্চা ১২৭
আধুনিক শিল্পচর্চার সূত্রপাত ১৫৯
আত্মানুসন্ধান ১৮৭
বিশ্বমুখিনতা ২০৭
টীকা ও তথ্যসূত্র ২২৫
গ্রন্থঋণ ২৩৫
নির্ঘণ্ট ২৪৩

শিল্পচর্চার আদিপর্ব

পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে মোট ষোলটি মহাজনপদের নাম ছিল। তারমধ্যে মগধ ছিল অন্যতম। মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল অঙ্গ, বঙ্গ, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, সমতটের, মত প্রাচীন বিভাগীয় জনগোষ্ঠী। যদিও এগুলির কোন সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। যা ছিল সেগুলিরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। একে বৃহৎ বঙ্গ বললেও এর মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের বসবাস ছিল মাত্র একটি অংশে। বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা বহুকাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল না। মৌর্য ও কুষাণ যুগে রাজনৈতিক ইতিহাস বাংলাকে স্পর্শ করেছিল ঠিকই কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বাংলা আক্রমণের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়েছিল। মৌর্য সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মকে প্রাধান্য দিতেন বলে সে-সময়ে হিন্দু শিল্প-সংস্কৃতির কোন প্রকাশ ঘটেনি। গুপ্ত সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে প্রাধান্য দিলে বাংলার হিন্দুরা লৌকিক দেব-দেবীর পূজা শুরু করেছিলেন। তাঁরা ব্যয় বহুল যাগ-যজ্ঞ ছেড়ে মূর্তি গড়ে পূজা করতেন। পূজা সম্পর্কযুক্ত ব্রত এবং ব্রতের মন্ত্র-ছড়ার জন্য রচিত ছবি তথা আলপনা ইত্যাদি ছিল বাংলার লোকায়ত শিল্পচর্চা। সমীবোধই আল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য। ব্রতচিত্রের সীমাবোধ, মাধুর্য ইতাদি প্রমাণ করে বাংলার ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এর যোগসূত্র বহুপূর্বের। এ-শিল্পের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত বাঙালী মেয়েদের অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ পেত আলপনার লতা-পাতা, শঙ্খ, পদ্ম-পাপড়ি ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহারে। আলপনা ছাড়াও মাটি দিয়ে তৈরী দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে হিন্দুরা ঘরের কুলুঙ্গীর মধ্যে সাজিয়ে রাখতেন। সেগুলিও বাংলার লোকশিল্প বস্তু। লৌকিক ও ধর্মীয় কাহিনী নিয়ে রচিত কাঠের পাটা, পুঁথি ও পাটচিত্রের আবির্ভাব অনেক পরে হয়েছিল। সেগুলির অনেকটাই সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাংলার আদিপর্বের শিল্প যেমন মাটির দেয়াল চিত্র, আল্পনা বা অতি প্রাচীন লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তিগুলি অতি ভঙ্গুর ও বাংলার আবহাওয়ার জন্য বেশিরভাগটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ে ৬০৬ সালে শশাঙ্ক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশ বছরের ঘোর অরাজকতা কাটিয়ে বাংলায় শুরু হয়েছিল পাল রাজত্ব। অষ্টম থেকে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় পাল রাজত্ব স্থায়ী ছিল। পালযুগের শিল্প বলতে তালপাতা, কাগজে, হাতে লেখা ও সেগুলির অঙ্গ সজ্জার জন্য আঁকা পুঁথি উল্লেখযোগ্য। পরিব্রাজক মাহুয়াম এ যুগে গৌড়ে অনেক পাশিক চিত্র শিল্পীদের দেখেছিলেন। অনেক পুঁথি লেখা ও আঁকা হয়েছিল সে সময়ে। বাংলার আর্দ্রভূমি ও অবহেলাকে এড়িয়ে সে সকল পুঁথির বিরাট সংগ্রহ বাংলার আদিপর্বের শিল্পকলার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অধ্যাপক শ্রীসরসী কুমার সরস্বতী 'পাল যুগের চিত্রকলা' গ্রন্থে মোট ষাটটি পুঁথির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অলোচিত সকল পুঁথিতেই ছবি আঁকাছিল। পালযুগের পর সেনযুগে শিল্পী শূলপাণির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। শূলপাণি বরেন্দ্রভূমির (উত্তরবঙ্গ) শিল্পী সঙ্ঘের প্রধান ছিলেন। ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপালের নামও উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই শিল্পকলার বিভিন্ন দিকে পারদর্শী ছিলেন। সে-সময়ে শিল্পীদের মধ্যে আরো যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র, কর্ণভদ্র, তাতট, মংকদাস, বিমল দাস, মহীধর, শশীদেব প্রমুখ। এ-সময়ে সমাজে শিল্পীদের পেশাকে প্রাধান্য দেওয়া হোত না। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে ভবদেব ভট্ট উল্লেখ করেছিলেন, 'নট, নর্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহনীয় নয়।'

সেন রাজত্বের পর বাংলায় সুলতান, আফগান, পরে মোঘলরা দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করলে বাংলরা শিল্পকলায় মোঘল দরবারী শিল্পের প্রভাব পড়েছিল। মোঘলদের পরে বাংলার নবাবেরা স্বাধীন হলে মোঘল দরবারী শিল্পীদের কেউ কেউ মুর্শিদাবাদে বসবাস ও শুরু করেছিলেন। চিত্রচর্চায় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা এঁনারা পাননি। এঁদেরই আঁকা ছবি শিল্পইতিহাসে 'মুর্শিদাবাদী কলম' নামে খ্যাত।

আঠারো শতকে সত্তর দশক থেকে পশ্চিমী চিত্রশিল্পীরা একে একে অর্থান্বেষে ভারতে আসতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণায় বাঙালী তরুণেরা শিল্পচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলরা তরুণেরা

পশ্চিমী চিত্রশিল্পীদের নিকট শিল্পের পাঠ নিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ সে-সময় থেকেই বিদেশে শিল্পশিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন।

বাংলায় পশ্চিমী শিল্পীরা

কোম্পানী যুগে অনেক বিদেশী চিত্রশিল্পী ভারতে এসেছিলেন। এঁনারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই ছড়িয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এঁরা দু'শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। অনুচিত্রশিল্পী ও তৈলচিত্রশিল্পী। তখন ভারতে আসতে হলে মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) বন্দরে নামতে হত। সরাসরি বাংলায় আসা যেত না। পশ্চিমী শিল্পীরা মাদ্রাজে নেমে তারপর নৌকা, ঘোড়া কিংবা পাল্কী করে বাংলাদেশে আসতেন। ১৭৬৯ সালে ইংরেজ শিল্পী টিলি কেটল প্রথম মাদ্রাজে নামেন। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৭১ সালে। টিলি কেটল লন্ডনের শিপলে আকাদেমীর ছাত্র ছিলেন। ১৭৮৩ সালে এসেছিলেন যোহান জেফানি। তিনি রোম থেকে শিল্পশিক্ষা নিয়েছিলেন, রয়্যাল আকাদেমীর সদস্যও ছিলেন। কলকাতার সেন্টজন গির্জায় জেফানির আঁকা 'শেষ নৈশ ভোজ' আছে। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এসেছিলেন টমাস হিকি। ১৭৮৬তে আসেন কাকা টমাস ড্যানিয়েল ও তাঁর ভাইপো উইলিয়ম ড্যানিয়েল। এঁনারা দুজনেই ভারতের এবং কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজচিত্র এঁদের সকলেরই আঁকা ছবিতে ফুটে উঠেছে।

১৭৮১ সালে এসেছিলেন উইলিয়ম হজেস, প্রিন্সেপ। ১৭৯১ তেএসেছিলেন ফ্রাঙ্ক বালথাজার সলভিন্স। তিনি ১৭৯৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাতে জানানো হয়েছিল যে, তিনি হিন্দু রীতিনীতি ও বেশভূষা ইত্যাদি বিষয়ে ২৫০টি রঙিন ধাতু খোদাই ছাপাই ছবির পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রতিটির মূল্য ধার্য করেছিলেন এক সিক্কা টাকা। কলকাতায় আসা এই সকল শিল্পীদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্মৃতি রেখে গেছেন। এই গ্রন্থের কোম্পানী যুগে শিল্পচর্চা পর্বে সে-সব প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমী শিল্পীদের কেউ কেউ বাংলার তরুণদের বিদ্যায়তনিক শিল্পশিক্ষা দেবার জন্য কিছু কিছু পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। ১৭৮৫ সালের ২১শে এপ্রিল হোন নামে একজন শিল্পীর দেওয়া বিজ্ঞাপন ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, 'কলকাতা শহরের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে হোন্ সাহেব তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে, সপ্তাহে তিনদিন করে তিনি তাঁর আস্তানায় ড্রইং ও পেন্টিং শিক্ষা দেবেন। যাঁরা হোন সাহেবের কাছে এই সুকুমার কলা শিখতে চান, তাঁরা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিকের রেট জানতে পারেন অথবা সোজা নিজেরা এসে রাধাবাজারে দেখা করতে পারেন তাঁর বাড়িতে।'

বাংলার তরুণদের প্রকরণগত শিল্পশিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা সম্ভবত এটিই প্রথম। হোনের পর সলভিনস-এর প্রচেষ্টাও সুবিদিত। উল্লিখিত কয়েকজন শিল্পী ছাড়াও আরো যাঁরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। যেমন, সলটিকফ, আর্থার উইলিয়ম ডেভিস, ফ্রান সেস্কো, জর্জ ফ্যারিংটন, চার্লস স্মিথ, টমাস হিকি, ওয়াসিম হামফ্রি, উইলিয়ম টেলর, মসিয়ে রিগো, ফাওলার, টেরি, কিপলিং, গ্রিফিথস, ডি. ফেবেক, রেনাল্ডি, এটিকিনসন, সিসিল এলাগি, এমিলি ইডেন, চার্লস ডয়েলি, জেমন বি. ফ্রেজার, সিজফিল্ড, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিন ভেরেঞ্চাগিন, এ. চিয়াপ্পিনি, জে. আরেন্টন, ফ্যানি পার্কস, এলিজা ফে, রোজ আলমার, এম্মা রবার্টস, এসথার লিজ, এমিলি ইডেন, লেডি ইমহফ, টি. ডব্লু. হেট, পীটার সেন্ক, গেবার্ড ভেণ্ডের ওচ, ক্যাপ্টেন রিচার্ড জাম্প, উইলিয়ম বেলি, উইলিয়ম লঙ্ঘামার, উইলিয়ম উড, ডি সেরেস, উইলিয়ম গর্ডন, এফ আর সে, উইলিয়ম সিম্পশন, টি মোরিস, উইলিয়ম ক্লাক্সটন, জর্জ থম্পসন প্রমুখ।

ইউরো-বেঙ্গল স্কুলের পর উনিশ শতকের শেষদিকে অবনীন্দ্রনাথের গবেষণায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ভারতীয় শিল্পের পরম্পরার নতুন রূপ। যা বেঙ্গল স্কুল নামে পরিচিত। মূলত বেঙ্গল স্কুল ঘরাণার মধ্য দিয়েই বাংলায় শিল্পচর্চার নবজাগরণ ঘটেছিল।

১

কোম্পানী যুগে শিল্পচর্চা

১। চার শ্রেণীর চিত্রশিল্পী
২। আদি পটুয়া
৩। দশাবতার তাস
৪। যমপট
৫। কালীঘাটের পটুয়া
৬। বটতলার চিত্রশিল্পী
৭। কোম্পানী চিত্রকর
৮। বিদেশী চিত্রকরেরা
৯। জঁ-জাঁক বেলনস
১০। জর্জ, চিনেরি, রবার্ট চিজহোম
১১। চার্লস গোল্ড
১২। মাদাম বেলনস, ফ্যানি পার্কস
১৩। কলকাতায় প্রথম লিথোপ্রেস
১৪। বিদ্যায়তনিক শিল্পচর্চা
১৫। কলকাতায় প্রথম চারুকলা সংস্থা
১৬। শিল্পচর্চায় সরকারি শিক্ষানীতির প্রভাব
১৭। মেকলের মন্তব্য
১৮। মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন—১
১৯। মেকানিক্স-এর শিক্ষক কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট
২০। মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন লন্ডন এবং কলকাতায়
২১। মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন—২
(মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন ও সংবাদ প্রভাকর)
২২। স্মরণীয় কালক্রম

কোম্পানী যুগে শিল্পচর্চা—১

চার শ্রেণীর চিত্রশিল্পী

আঠারো শতকের শেষদিকে ইংরেজ চিত্রশিল্পী হোন (সাহেব) ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন[১], সে বিজ্ঞাপনে তিনি কলকাতার যে সকল মানুষ শিল্পশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলেছিলেন। সে-সময়ে কলকাতা পত্তন হয়ে গেলেও শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র কোথাও গড়ে ওঠেনি। তবে বহু ইংরেজ শিল্পী সে সময়ে কলকাতায় এসে যাবার ফলে বিদেশ থেকে কলকাতার বাজারে মাঝে মাঝে কিছু পেন্টিং-এর বই আসত। ক্যালকাটা-গেজেটে সে-সব বই এর বিজ্ঞাপন আছে। সে-সময়ে বাংলার চিত্রচর্চা বলতে ছিল পটুয়াদের লোকায়ত চিত্রচর্চা, আর ছিল মুর্শিদাবাদ এবং পরে কলকাতার আশেপাশে ছিল কোম্পানী চিত্রশিল্পীদের চিত্রচর্চা।

উনিশ শতকের প্রথম দশকে কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে একদল পটুয়া মন্দির সংলগ্ন পথের ধারে পট এঁকে পূণ্যার্থীদের কাছে বিক্রি করতেন। গ্রাম বাংলার পটে অঙ্কিত বিষয় থেকে কালীঘাটের পটুয়ারা পৃথকভাবে বিষয় নির্বাচন করে পটে ছবি এঁকে বাংলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। কালীঘাটের শিল্পীরা ছাড়াও ছাপচিত্র শিল্পীও ছিলেন। তাঁরা বটতলা অঞ্চলে ছাপার জন্য ছবি আঁকতেন। এঁরা দুটি দলে কাজ করতেন। একদল ছিলেন তক্ষণে পারদর্শী আর অপর দল ছিলেন তক্ষণের উপযুক্ত অঙ্কনে পারদর্শী। কালীঘাট পটের সঙ্গে বটতলার ছাপচিত্রের বেশ মিল পাওয়া যায়। বটতলার তক্ষণ শিল্পীরা কালীঘাটের পটচিত্রের শিল্পীদের থেকে ছবি আঁকিয়ে নিতেন বলে মনে করা হয়।

আদি পটুয়া

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পটুয়াদের শৌভিক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বেও ভারতবর্ষে পটুয়াদের যে অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জৈন তীর্থঙ্করের জীবনী থেকে। উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর 'আজীবক' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নালন্দাগ্রামের একজন মঙ্খ (পটুয়াপুত্র) ছিলেন।

বাংলায় যেসব জেলায় একসময় পটুয়াদের অস্তিত্ব ছিল কিম্বা এখনো আছে, তারমধ্যে বীরভূমের নলহাটি, দাদপুর, খিল্লি, সিউড়ি, ইটাগড়িয়া, বালিয়া, চাঁদপাড়া, কুসুমগ্রাম, আহম্মদপুর, কলিতা, পানুরিয়া ইত্যাদি গ্রামের নাম করা যেতে পারে। পানুরিয়া গ্রামের ছবিলাল চিত্রকরের কথা গুরুসদয় দত্তের ' পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরভূমের শক্তিপট বিখ্যাত ছিল। এখানকার পটুয়ারা দেবদেবীর চিত্রই আঁকতেন। পরে অনেক চিত্রকর সিদো-কানহুর আন্দোলনের ছবিও পটেতে এঁকেছেন।

মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি, মুরাদপুর, কুমিরমারা, মানিকচক, নয়া হবিবচক, দাঁতন, শালবনী, মহিষাদল, সূতাহাটা, আমদাবাদ, নাড়াজোল, বাসুদেবপুর ইত্যাদি গ্রামে পটুয়াদের বাস ছিল। মেদিনীপুরের দীঘলপট, চৌকোপট বিখ্যাত ছিল। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, শুশুনিয়া,

খাতরা, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি অঞ্চলে পটুয়াদের গ্রাম আছে। বিষ্ণুপুরের 'দশাবতার তাস'-ও একসময় খুবই বিখ্যাত ছিল।

দশাবতার তাস

বিষ্ণুপুরে 'দশাবতার তাস' যাঁরা আঁকতেন তাঁরা ছিলেন সূত্রধর। এঁরা মূলত ছুতোর মিস্ত্রি হলেও, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পট আঁকতেন। সূত্রধরদের কাজের নিদর্শন আছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বহড়ু মন্দিরের দেয়ালে। সে মন্দিরের দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি আঁকা হয়েছিল ১৮২৫ সালে। এঁকেছিলেন দুর্গারাম ভাস্কর। ইনি একজন সূত্রধর ছিলেন।[২] অধুনালুপ্ত এই সূত্রধর শিল্পীরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যেমন কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র। শেষ শ্রেণীর সূত্রধরেরাই অর্থাৎ 'চিত্র' শ্রেণীর সূত্রধরেরাই 'তাস' আঁকতেন। তাস আঁকা হত বৃত্তাকারে। দশাবতার হল মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, ভৃগুরাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কী। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সময় এই তাস খেলার সূত্রপাত হয়েছিল।[৩] মল্ল রাজা ও রানিরা এই তাস নিয়ে খেলতেন। শেষ মল্লরাজা কালীপ্রসাদ সিংহঠাকুর ও এ খেলা নিয়মিত খেলতেন। প্রতিটি তাস ১২ টা করে মোট ১২০টা তাস ৪ জনে মিলে খেলতেন। পূর্বে আরব দেশে এ খেলা হত। ওখানেই এ খেলার সূত্রপাত ঘটেছিল। আরবদেশে এ খেলার নাম ছিল গঞ্জিকা। আরব থেকে এ খেলা ওড়িশায় আসে। তারপর বিষ্ণুপুরে। পালযুগে এই পটশৈলীর উন্নতি ঘটেছিল। প্রতীক ধর্মী এ ছবিগুলি আঁকা হত দেশজ রঙ দিয়ে। 'তাস' ছাড়াও বাঁকুড়ার বেশকিছু পটচিত্রে মুঘল চিত্ররীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পূর্ববঙ্গে এক সময় গাজীর পটও বেশ নাম করেছিল। বাংলায় পটুয়াদের কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে পূর্ববঙ্গের গাজি সাহেবরা এক ধরনের পট এঁকে তাঁদের কাজে ব্যবহার করতেন।

পটুয়াদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে পট ও পটুয়াদের গানের (রামায়ণ, পুরাণ, শিব-গৌরী সংবাদ, বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী, গৌরাঙ্গলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং মঙ্গলকাব্যগুলিকে নিয়ে রচিত) সন্ধান যিনি আমাদের সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিলেন, সেই গুরুসদয় দত্ত লিখেছিলেন, '.....এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর, প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখায় সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও.....কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অ-মিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পরিমাপ কাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার লীলা খেলার চতুরতা ও বাহুল্য মিলাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণ ভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষ বিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্তভাব পরিপূর্ণ।[১] পটুয়াদের আঁকাপট ও পটুয়া সঙ্গীতের কথা সকলে অবগত হলেও তাঁদের সামাজিক ও আর্থ জীবনের দিকটা খুবই কষ্টের। সমাজে তাঁরা বসবাস করলেও জাতিতে তাঁরা হিন্দু না মুসলিম এ বিচার করা খুব মুশকিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, তাঁরা আসলে হিন্দু ছিলেন। এক সময় হিন্দু সমাজ পটুয়াদের ঘৃণা করত, তাঁদের সমাজে স্থান দিত না। মুসলমানেরা এই সুযোগে এঁদের ধর্মান্তরিত করেছিল। তাঁরা মুসলিম ধর্মগ্রহণ করলেও হিদু দেব-দেবীর পূজার্চনা করতেন। তাঁদের ক্ষোভ, হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে তারা পতিত হয়েছেন। পটুয়ারা হিন্দুদের মতো পূজাপাঠ করলেও তাঁরা নমাজ করেন। পটুয়াদের গ্রামে কোনো মসজিদ দেখা যায় না। শুধু মাত্র মেদিনীপুরের চেতুয়া বাসুদেব

পুরের কাছে নির্ভয়পুরের পটুয়াগ্রামে একটা ভাঙ্গা মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে।[৪] মুসলিমরা পটুয়াদের ধর্মান্তরিত করলেও হিন্দুরা পরবর্তীকালে শুদ্ধি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন,[৫] '.....এদিকে তো পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কুলগাছিয়া স্টেশনের এক সহকারি স্টেশন মাস্টার সে সময়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এখানকার পটুয়াদের শুদ্ধি করানোয় সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। আগেই বলেছি, এ পটুয়াপাড়ার পাশেই ছিল মুসলমান বসতি। সে সময় মুসলিম লীগের আমল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্টের বাড়ি আবার এই মুসলিম পল্লীতেই। সুতরাং বেশ বাধা এসে গেল। মুসলিম সমর্থক প্রেসিডেন্ট মশায় রেল কোম্পানিকে দরখাস্ত দিয়ে এই সহকারী স্টেশন মাষ্টারটিকে বদলি করার ব্যবস্থার করে ফেললেন এবং অন্যদিকে এখানকার পটুয়াদের একেবারে মুসলমান হয়ে গিয়ে প্রতিমা নির্মাণ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু চণ্ডীপুরের পটুয়াদের তো তখন সম্বল মাত্র প্রতিমা নির্মাণ ও পুতুল তৈরি যার থেকে দু-পয়সা রোজগারের মুখ দেখা যায়। তাই প্রেসিডেন্টের হুমকি সত্ত্বেও এরা শেষ পর্যন্ত শুদ্ধি করে পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেলেন।[১]

যমপট

যমপট বা যমপডং। বিশাখা দত্তের মুদ্রারাক্ষসের এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে, একজন গুপ্তচর যমপট নিয়ে নিজের ঘর থেকে বের হবার সময় বলেছেন, 'যমের চরণে প্রণাম কর, কারণ তুমি অন্য দেবতার দ্বারা উপকৃত হবে না। তিনি অন্য সব দেবতাদের ধ্বংস করেন, তিনি সন্তুষ্ট হলে তার ভক্তদের জীবন রক্ষা পায়। তিনি জগতের ধ্বংসকারক, তাঁর আশীর্বাদে আমরা দীর্ঘজীবী হই। তাই ঘরে প্রবেশ করে যমের ছবি (যমপডং) দেখিয়ে আমি তার গান গাই।[১]

সাধারণভাবে যে যমপট দেখা যায় তা, যেকোনো জড়ানো পটের শেষ প্রান্তে জুড়ে দেওয়া যমরাজ বা যমালয়ের ছবিযুক্ত পট। এইসব পটে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, চণ্ডীমঙ্গল কিংবা মনসা মঙ্গল-এর ছবি থাকে। যমপট দেখিয়ে পটুয়ারা পটের কাহিনী শুনিয়ে শেষে যমরাজের বৃত্তান্ত বলে শ্রোতা-দর্শকদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, যমের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। নিস্তার পেতে গেলে ভালো কাজ করতে হবে। যমপট এভাবে যুগ যুগ ধরে লোক শিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দিয়ে এসেছে। যমপটের উল্লেখ আছে কালীদাসের রচনায়, বাণভট্টের হর্ষচরিতে এবং ভবভূতির উত্তর রামচরিতে।

চক্ষুদান পট

এই পট প্রচলিত আছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে। বিশেষত সাঁওতালদের মধ্যে। এদের মধ্যে পুরোহিত শ্রেণীর জাদু-পটুয়ারা সমাজের কেউ মারা গেলে মৃতের একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে শোক-সন্তপ্ত পরিবারটিতে উপস্থিত হতেন। ছবিটি একটি চৌকো পটের উপর আঁকা হত। জাদু-পটুয়া পটের ছবিটির চোখের তারা এঁকে আনতেন না। বিশ্বাস, পটের ছবিটিতে চোখের তারা এঁকে দিলে মৃতের আত্মা শান্তি পাবে।

মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে পটুয়াকে দেওয়া হত বিভিন্ন জিনিস। আর জাদু-পটুয়া

সকলের সামনে পটটিতে চক্ষুদান করতেন। সেই কারণে এই পটকে চক্ষুদান পট বলা হয়ে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে এই পট বেশকিছু সংরক্ষিত আছে।

পটে দেশজ রঙ ব্যবহার করা হত। গেরি, এলা, হরিতাল, হিঙ্গুল, শঙ্খের সাদা, ভুসো, চুন, কাঁচা হলুদ, খয়ের, পুঁই মেটুলী, পাথুরেখড়ি ইত্যাদি রঙের জন্য ব্যবহার করা হত। বাংলার পটে গুজরাটি ও রাজস্থানী চিত্রের মুখাবয়বের মিল পাওয়া যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পটের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায়, ভারতীয় জাদুঘর, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম (জোকা), কলাভবন চিত্রশালা প্রভৃতির সংগ্রহে। এছাড়াও আঞ্চলিকভাবে সৃষ্টি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহশালাগুলিতেও পটের সংগ্রহ আছে। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এক ঐতিহাসিক পট, 'রামায়ণ পট'। জড়ানো পট হিসেবে রামায়ণ পটটি সবচেয়ে পুরাতন বলে ঐতিহাসিকেরা মন্তব্য করেছেন। এই মিউজিয়ামেই ভারতীয় পটের সংগ্রহ আছে প্রায় ছয়শত পঞ্চাশটির মতন। এছাড়া চেষ্টার হেরউইৎজ্ (নিলামদার)-এর সংগ্রহেও প্রায় পাঁচ শতাধিক বিভিন্ন পট রয়েছে।

কালীঘাটের পটুয়া

গ্রামের পটুয়া শিল্পীদের বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। কলকাতার পটশিল্পী অর্থাৎ কালীঘাটের পটুয়াদের কথা আলোচনায় আসার পূর্বে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, কলকাতার পটুয়াটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই পটুয়াদের বসবাস ছিল। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় কলকাতা শহর সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের হয়ে যাওয়ায় এবং ১৮০৯ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা[৬] কালীঘাট অঞ্চলের মন্দিরটি সংস্কার করলে গ্রাম-গঞ্জ থেকে পটুয়া শিল্পীরা মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বিশেষত মেদিনীপুর থেকে অনেক পটুয়া জীবিকার সন্ধানে চলে এসেছিলেন। কালীঘাট পট শৈলীর শেষ চিত্রকর[৭] শ্রীশ চিত্রকরের পূর্ব পুরুষেরা মেদিনীপুরেই থাকতেন। কলকাতার পটুয়াটোলা কিংবা চিৎপুরের পটশিল্পীরাও কালীঘাটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এঁরা জাতিগতভাবে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যেমন, কাটাকাটী, বসনতরী, সাতকুড়ি, চৌপলকাটা, আটকুড়ি ও বেজো। এঁদের মধ্যে 'বসনতরী' শ্রেণীর পটুয়ারাই কালীঘাট অঞ্চলে পট আঁকতেন।

উনিশ শতকের পূর্বে কালীঘাট মন্দিরটি সম্পূর্ণ জঙ্গলে ঢাকা ছিল। জীবজন্তু ডাকাতের ভয়ে পূজাপাঠের জন্য মন্দিরে কেউ যেতেন না। মন্দিরটি সংস্কার হলে পূণ্যার্থীদের সমাগম শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এখানে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বহু মানুষের সমাগম ঘটতে শুরু করেছিল। জোতিরিন্দ্র জৈন লিখেছিলেন, "……এই সময়েই কলকাতা (হাওড়া) সর্বভারতীয় রেলের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে কলকাতায় ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।……বহিরাগতরা সবাই প্রায় চাইতেন একটা না একটা স্মারক নিয়ে ফিরে যেতে।"[৮] কালীঘাট মন্দিরের প্রাঙ্গন থেকে সেই স্মারক হিসেবে তীর্থযাত্রীরা পটুয়াদের থেকে পট কিনে নিয়ে যেতেন। সারা বছরই পটুয়ারা পট আঁকলেও বিশেষ বিশেষ পুজো-পার্বনের সময় তাঁরা প্রতিমা গড়তেন। এঁরা বিভিন্ন আকৃতির পট আঁকলেও কালীঘাট পট বিখ্যাত হয়ে আছে চৌকো পট হিসেবে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত

এক ধরনের উচ্চমানের জল রঙের ছবি বঙ্গদেশে আঁকতেন পটুয়া নামে এক শ্রেণীর মানুষ। এঁদের জাত ব্যবসা ছিল প্রতিমায় রঙ লাগানো। অতি যত্নে ছবিগুলো আঁকা হত। এঁদের রঙ চাপানো এবং সাজানোর ব্যাপারে সুচারু রুচির পরিচয় পাওয়া যেত।'

উনিশ শতকের গোড়ায় বিদেশী সংস্কৃতির স্পর্শে কলকাতার বাঙালিদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন (আদব-কায়দা) ঘটলে, কালীঘাটের পটুয়া সমাজ সেই বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করে পটচিত্রের বিষয়কে পরিবর্তন করেছিলেন; অর্থাৎ দেব-দেবীর পট আঁকা ছেড়ে বাবু বিলাসের ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন, '.....এগুলি কালীঘাট মন্দিরের আশে পাশের দোকানে পাওয়া যায় হাজার হাজার। বিষয় সাধারণত পৌরাণিক; কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় জীবনের মজাদার কয়েকটি দিক নিয়েও তাঁরা আঁকছেন..,(১৮৮৮) তাঁরা এঁকেছিলেন 'পাকানো চাদর গলায় বিলাসী ফুলবাবু', 'গড়গড়ার নল মুখে সাহেব', 'শালঙ্কারা যুবতী', 'পটের বিবি', 'গোলাপ সুন্দরী', 'আয়না সুন্দরী', 'শুক সুন্দরী' ইত্যাদি পট।

কালীঘাট পটে বাবু বিলাসের ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল প্রায় ১৮২৫ সালের পর থেকে। এ ধরনের ছবি আঁকা চলেছিল বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্যন্ত। পটের ছবির অবয়বগুলি ছিল স্থূলাকৃতি। এই সকল পটুয়ারা পট আঁকার পাশাপাশি যেহেতু প্রতিমা গড়তেন, সে কারণেই তাঁদের পটচিত্রে প্রতিমার মতো ত্রিমাত্রিক গোল-গোল স্থূলাকৃতি অবয়বের রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। পটুয়ারা সরু রেখার পাশে চওড়া রঙের পর্দা দিয়ে অবয়বগুলোকে নধরকান্তি করার চেষ্টা করতেন। বিজ্ঞানসম্মত আলোছায়ার খেলা সেখানে একেবারেই নেই।

কালীঘাটের পটশিল্পীরা প্রথমদিকে প্রাকৃতিক রঙেই পট আঁকতেন। পরবর্তী সময়ে এঁদের আঁকা ছবিতে স্বচ্ছ জল রঙের প্রলেপ দেখা যায়। অনুমান করা হয় তাঁরা বিদেশী স্বচ্ছ জল রঙও ব্যবহার করতেন। উনিশ শতকে বিদেশ থেকে জল রঙ-এর কেক আসত কলকাতার বাজারে। বিশেষত উইনসর-নিউটন কোম্পানীর কেক্। কালীঘাটের পট শিল্পীরা একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকত বলে, তাঁদের পক্ষে বিদেশী রঙ সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না।

এ-শিল্প কালীঘাট মন্দিরে তীর্থ করতে আসা পূণ্যার্থী ও বাবু সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এই শৈলীর প্রসার মূলত কোম্পানীর যুগে হলেও কোম্পানীর লোকজন বা কর্মচারিদের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। উনিশ শতকের শেষদিকে এই শৈলীর দৈন্যতা এসেছিল। কলকাতার সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যায়তনিক শিল্পের কাছে ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছিলেন, '.....ইদানিং এই শিল্পকর্মে অবনতির সূচনা হয়েছে, কলকাতার আর্ট ইস্কুলে ছাত্রদের রঙ করা দেবদেবীর ছাপাই ছবি বাজারে আসার দরুন। পুরানো রীতিতে আঁকা ছবি এখনও পাওয়া যায় অন্যূন ১০ টাকা বা অধিক মজুরা দিলে। পটুয়ারা এখন নিম্নমানের ছোপ দিয়ে আঁকছেন।'

এই শৈলী বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্যন্ত স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল। সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় উইলিয়ম আর্চারের লেখা থেকে। তিনি লিখেছিলেন[৯] যে, কালীঘাট অঞ্চলের বাসিন্দা কালীচরণ ঘোষ ও নিবারণ ঘোষ, এই দুই পটশিল্পীর মৃত্যুর (১৯৩০ সাল) সঙ্গে কালীঘাট শৈলীর সুবর্ণ যুগের অবসান ঘটেছিল। আর্চারের কথাই ঠিক যে, এই শৈলীর সুবর্ণ যুগের অবসান তিরিশ দশকেই হয়েছিল। কিন্তু আর্চারের অপর বক্তব্যটি ঠিক নয়, যে কালীচরণ